Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – 3, Issue-I, published on January 2023, Page No. 73 –83
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 – 0848

মহাভারতের সাহিত্য-মূল্য নিরূপণে রবীন্দ্রনাথ

Tagore in Judging the Literary Value of the Mahabharata

শিবনাথ দত্ত
বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন
ইমেইল : shibnathdutta199@gmail.com

Keyword
Mahabharata, Rabindranath Tagore, Essays, Letters, Literary view, Literary value, Epic, Characters, Impolations.

Abstract
The literary value of the Mahabharata in Rabindranath Tagore's view is the main topic of this discussion. The Mahabharata is one of the greatest ancient literary texts, which spread their influence on the creations of a much later period, overcoming the boundaries of space and time. It also takes on new forms for various critics. Rabindranath Tagore is an important figure in the criticism of the Mahabharata in twentieth-century Bengali literature. He discussed this epic from many different angles. Rabindranath didn't write a single essay on the Mahabharata, but scatteredly he delivered many remarks about this epic. As literature it was criticised by him in his many essays and letters.

Rabindranath's remarks on the Mahabharata's literary value have some important points. These are like the Mahabharata's genre, technique of creation, characters, inconsistencies, impolations etc. These points have been focused on in our discussion. Rabindranath, in his book 'Adhunik Sahitya', said that he had judged Mahabharata as historical poetry. And indirectly he judged it as an epic also. According to Rabindranath, the Mahabharata's structure is very strong. He appreciated the Mahabharata's technique of creation. Rabindranath discussed the Mahabharata's characters in his many essays and letters. He did a comparative analysis between the Mahabharata's characters and modern Bengali novel characters. He thought that, the Mahabharata's characters were not as perfect those in the modern Bengali novels. But in spite of that, Mahabharata's characters must survive year after year. Rabindranath judged the Mahabharata's inconsistencies from the perspective of literary criticism. His view about the Mahabharata's later impolation was very scientific. According to him, it would be better if the original form of this epic could be discovered. He thought that the operation should be done by an objective researcher.

These points have been discussed in detail in our essay. Generally, Rabindranath's philosophical view about the Mahabharata is too much discussed. But he looked over this text as literature, too. He is one of the most important literary critics of the Mahabharata. Rabindranath's literary view of the Mahabharata is a very important topic to discuss.

Discussion

বিংশ শতাব্দীতে বাংলা ভাষায় মহাভারত সম্পর্কে আলোচনা যাঁরা করেছেন, তাঁদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নামটি প্রথমেই উঠে আসে। দীর্ঘ সাহিত্য-জীবনে তিনি প্রধানত মহাভারতের উপর ভিত্তি করে নির্দিষ্ট কিছু মননশীল রচনা করেননি। কিন্তু তাঁর বিভিন্ন ভাবনা-চিন্তার মধ্যে মহাভারতের প্রভাব আমরা লক্ষ করি। মহাভারতের প্রসঙ্গ তাঁর প্রবন্ধ ও চিঠিপত্রে বারবার এসেছে। সংস্কৃত ভাষার মহাভারত তিনি পড়েছিলেন কিনা তা নিশ্চিত ভাবে জানা যায় না। কিন্তু কাশীরাম দাসের ভারত-পাঁচালী এবং কালীপ্রসন্ন সিংহ কর্তৃক অনূদিত মহাভারত যে তাঁর পঠিত ছিল এ-কথা অনেক জায়গায় তিনি উল্লেখ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে প্রকাশিত কাশীরাম দাসের মহাভারত পাঠ করতেন বলে শ্রীদেবীপদ ভট্টাচার্য তাঁর 'মহাভারত-প্রসঙ্গ ও রবীন্দ্রনাথ' নামক প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন।[১] রবীন্দ্রনাথও অল্প বয়স থেকেই মহাভারত পাঠ করতেন বলে জানা যায় এবং মহাভারত-চিন্তনও তাঁর সাহিত্যজীবনের প্রথম থেকে শেষ পর্যায় পর্যন্ত লক্ষ করা যায়। একদিকে তিনি 'গান্ধারীর আবেদন', 'কর্ণকুন্তীসংবাদ', 'নরকবাস', 'চিত্রাঙ্গদা' ইত্যাদি সৃজনশীল সাহিত্য মহাভারত অবলম্বনে রচনা করেছেন। আবার অন্যদিকে মহাভারত তাঁর মননশীল রচনার ক্ষেত্রেও চিন্তনের রসদ জুগিয়েছে বলা যায়। বিভিন্ন প্রবন্ধ এবং চিঠিপত্রে মহাভারত সম্পর্কে যে-সমস্ত আলোচনা তিনি করেছেন, তার কয়েকটি দিক আমরা দেখতে পাই। যেমন- মহাভারতের সাহিত্যমূল্য, ঐতিহাসিকতা, নৈতিকতা, দর্শন ইত্যাদি। সাহিত্যমূল্যের প্রসঙ্গ এগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ইংরেজিতে যাকে 'epic' বলা হয়, রামায়ণ ও মহাভারতকে সাধারণভাবে সেই শ্রেণির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়ে থাকে। মহাভারতকার একে ধর্মশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র, কামশাস্ত্র ইত্যাদি বলে অভিহিত করেছেন। সংস্কৃত সাহিত্যে রামায়ণকে কাব্য বলে উল্লেখ করা হলেও মহাভারতকে ইতিহাস নাম দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণচরিত্র' গ্রন্থের সমালোচনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,

> "...আমরা মহাভারতকে ঐতিহাসিক কাব্য বলিয়া গণ্য করি।"[২]

মহাভারতের কাব্যমূল্য বা সাহিত্যমূল্য সম্পর্কে তাঁর মন্তব্যগুলি বিভিন্ন রচনার মধ্যে ছড়িয়ে আছে। এগুলি পর্যবেক্ষণ করলে মহাভারতের সংরূপ-প্রসঙ্গ, নির্মাণ-কৌশল, চরিত্র-প্রসঙ্গ, অসংগতি-প্রসঙ্গ, প্রক্ষিপ্ত সম্পর্কিত মন্তব্য ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলি উঠে আসে। এই সমস্ত দিক সম্পর্কে আমরা এই প্রবন্ধে আলোকপাত করব।

মহাভারতের সংরূপ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মনোভাবের প্রতি প্রথমে দৃষ্টিপাত করা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথ মহাভারতকে 'ঐতিহাসিক কাব্য' বলে মনে করলেও, অন্যান্য সাধারণ কাব্যের সঙ্গে এর পার্থক্যটিকেও নির্দিষ্ট করেছেন বিভিন্ন জায়গায়। মহাকাব্যের লক্ষণ হিসেবে সাধারণভাবে তার আয়তনের বিশালতা ও ভাবের মহত্ত্বের কথা বলা হয়ে থাকে। রবীন্দ্রনাথ মহাভারতের সেই বিশালতা ও মহত্ত্বের দিকটিকে বিভিন্ন জায়গায় উল্লেখ করেছেন। দীনেশচন্দ্র সেনের 'রামায়ণী কথা' গ্রন্থের ভূমিকায় (যা 'প্রাচীন সাহিত্য' গ্রন্থে 'রামায়ণ' নামে সংকলিত) তিনি মহাকাব্য সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন,

> "আধুনিক কোনো কাব্যের মধ্যেই এমন ব্যাপকতা দেখা যায় না।"[৩]

তিনি আরো বলেন,

> "ইঁহারা প্রাচীনকালের দেবদৈত্যের ন্যায় মহাকায় ছিলেন, ইঁহাদের জাতি এখন লুপ্ত হইয়া গেছে।"[৪]

রামায়ণ ও মহাভারত সম্পর্কে তিনি এ-কথা বলেছেন। মহাভারতের উপর তন্নিষ্ঠ কোনো আলোচনা তিনি না করলেও, বিভিন্ন জায়গায় প্রাপ্ত বিভিন্ন মন্তব্য থেকে বোঝা যায় মহাভারতের বিশালতাকে রবীন্দ্রনাথ গভীরভাবে অনুভব করেছিলেন।

একটি জাতির সমগ্র জীবনের কথা মহাকাব্যের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ। মহাভারতে ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনের কথা প্রকাশিত হয়েছে বলে রবীন্দ্রনাথ মনে করেছেন। রামায়ণ-মহাভারতকে তিনি বলেছেন,

> "...যেন জাহ্নবী ও হিমাচলের ন্যায় তাহারা ভারতেরই, ব্যাস-বাল্মীকি উপলক্ষ মাত্র।"[৫]

তাঁর মতে,

> "...ভারতবর্ষ রামায়ণ-মহাভারতে আপনাকে আর কিছুই বাকি রাখে নাই।"[৬]

হেমন্তবালা দেবীকে লেখা একটি পত্রে তাঁর মন্তব্য,

> "যথার্থ ভারতবর্ষ মহাভারতবর্ষ।"[৭]

মহাভারতকে রবীন্দ্রনাথ ইতিহাস বলেও মনে করেন। মহাকাব্যের একটি লক্ষণ হল তা সম্পূর্ণ কল্পিত কাহিনি হবে না, পৌরাণিক অথবা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ হতে হবে। তবে রবীন্দ্রনাথ মনে করেন মহাভারত তথ্যমূলক নয়, ভাবমূলক ইতিহাস। তাঁর মতে এর ভাব হল বৈরাগ্যের ভাব—

> "মহাভারতে যে একটা বিপুল কর্মের আন্দোলন দেখা যায় তাহার মধ্যে একটি বৃহৎ বৈরাগ্য স্থির অনিমেষ ভাবে রহিয়াছে।"[৮]

ভারতীয় জীবনবোধ ও দর্শনের সঙ্গে তিনি মহাভারতের একাত্মতা লক্ষ করেছেন। মহাকাব্যে এইভাবে কোনো একটি জাতির অখণ্ড জীবনবোধের প্রকাশ ঘটে থাকে। রবীন্দ্রনাথ মহাভারতে ভারতীয় জাতির একান্ত নিজস্ব জীবনবোধের প্রকাশ দেখতে পেয়েছেন—

> "...ইহার সরল অনুষ্টুপ ছন্দে ভারতবর্ষের সহস্র বৎসরের হৃৎপিণ্ড স্পন্দিত হইয়া আসিতেছে।"[৯]

ভবতোষ দত্ত তাঁর 'Rabindranath Tagore on the Ramayana & the Mahabharata' নামক রচনায় এ-বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে ইউরোপীয় জীবনবোধের সঙ্গে তুলনা করে বলেছেন যে এই ভাব একান্তভাবেই ভারতবর্ষের।[১০] রবীন্দ্রনাথ এই বিষয়টির উপরে বারবার গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

সাহিত্যের রূপ-রীতিতে মহাকাব্যের লক্ষণ সম্পর্কে এই বৈশিষ্ট্যগুলির কথাই বলা হয়ে থাকে। অর্থাৎ মহাভারতের মহাকাব্যত্বের লক্ষণগুলিকে রবীন্দ্রনাথ পরোক্ষভাবে আলোচনা করেছেন বলা যায়। 'আরোগ্য' প্রবন্ধে তিনি এক জায়গায় মহাভারত সম্পর্কে 'কাব্য' শব্দটি ব্যবহার করেন। ভবতোষ দত্ত তাঁর 'Rabindranath Tagore on the Ramayana & the Mahabharata' নামক গ্রন্থে এই জায়গাটি ইংরেজিতে অনুবাদ করে উদ্ধৃত করেছেন। সেখানে তিনি 'কাব্য'-এর ইংরেজি প্রতিশব্দ হিসেবে 'epic' লিখেছেন।[১১] ভবতোষ দত্তের এই শব্দচয়নের বিষয়টিকে সূক্ষ্মভাবে দেখলে বোঝা যায় মহাভারত যে রবীন্দ্রনাথের কাছে মহাকাব্য হিসেবেই পরিগণিত হত, তা তিনিও মনে করতেন।

মহাভারতের গঠন বা নির্মাণকৌশলের প্রশংসাও রবীন্দ্রনাথ করেছেন। 'সাহিত্যের স্বরূপ' গ্রন্থের 'সাহিত্যের মাত্রা' নামক প্রবন্ধে তিনি মন্তব্য করেছেন,

> "মহাভারতে নানা কালে নানা লোকের হাত পড়েছে সন্দেহ নেই। সাহিত্যের দিক থেকে তার উপরে অবান্তর আঘাতের অন্ত ছিল না, অসাধারণ মজবুত গড়ন বলেই টিকে আছে।"[১২]

বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কবির রচনা মহাভারতে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে, বুদ্ধদেব বসুর ভাষায় "যাঁদের রচনাশক্তি দুস্তরভাবে অসমান"।[১৩] মূল রচনার ভিতরে বহু প্রতিভাবান কবির রচনা যেমন প্রবিষ্ট হয়েছে, তেমনি সেই অর্থে প্রতিভাবান নন এমন অনেক কবির লেখারও মহাভারতে অনুপ্রবেশ ঘটেছে, বঙ্কিমচন্দ্র যেগুলিকে 'ছাইভস্ম মাথামুণ্ড'[১৪] ও সমালোচনার অযোগ্য বলে উল্লেখ করেছেন। এই জাতীয় প্রক্ষিপ্ত কোনো রচনার মধ্যে প্রবিষ্ট হলে তার মধ্যে সংগতি বজায় থাকা তো নয়ই, গঠনের ভিত্তি বজায় থাকাটাও দুঃসাধ্য। কিন্তু তা সত্ত্বেও মহাভারতের মধ্যে সমালোচকেরা একটি অন্তর্নিহিত সামঞ্জস্য লক্ষ করেন এবং তার ভিত্তিমূলও অবিকৃত আছে বলে মনে করেন। 'অসাধারণ মজবুত গড়ন' বলতে রবীন্দ্রনাথ এই দিকটির প্রতিই ইঙ্গিত করেছেন।

মহাভারতের বিভিন্ন চরিত্র সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিভিন্ন রচনায় কিছু কিছু মন্তব্য করেছেন। সাহিত্যমূল্য প্রসঙ্গের আলোচনায় চরিত্র সম্পর্কিত সেই মন্তব্যগুলি অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। রবীন্দ্রনাথ মহাভারতের চরিত্রদের প্রতি কীভাবে দৃষ্টিপাত করেছেন, মহাভারতের চরিত্র হিসেবে তাঁদের কী বিশেষত্ব তিনি দেখতে পেয়েছেন, চরিত্র আলোচনায় কোন কোন দিক তাঁর চোখে ধরা পড়েছে এগুলি আমাদের দ্রষ্টব্য। এক-একজন চরিত্র ধরে বিষয়টির প্রতি আমরা আলোকপাত করব।

মহাভারতের চরিত্রদের প্রতি রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে আলোচনায় ভীষ্ম চরিত্রটিকে প্রথমে বেছে নেওয়া যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিভিন্ন লেখায় ভীষ্ম চরিত্রের নাম উল্লেখ করলেও তাঁর প্রতি সেভাবে গুরুত্ব আরোপ করেননি।

'সাহিত্যের স্বরূপ' গ্রন্থের অন্তর্গত 'সাহিত্যের মাত্রা' ও 'সাহিত্যে চিত্রবিভাগ' প্রবন্ধ, 'পঞ্চভূত' গ্রন্থের 'মনুষ্য' নামক রচনা ইত্যাদিতে ভীষ্ম চরিত্রের উল্লেখ লক্ষ করা যায়।

'সাহিত্যের মাত্রা' প্রবন্ধে মহাভারতের শান্তিপর্ব ও অনুশাসনপর্ব জুড়ে ভীষ্মের যে নীতিবাক্য, তা 'সাময়িক প্রয়োজনের প্রাবল্য' থেকে জাত বলে রবীন্দ্রনাথ মনে করেছেন।[১৫] তিনি মনে করেন—

> "তাতে ভীষ্মের চরিত্র গেল তলিয়ে প্রভূত সদুপদেশের তলায়।"[১৬]

কোনো চরিত্রের ক্ষেত্রে সাময়িক প্রয়োজন সাধনের তাগিদে সাহিত্যের মাত্রা লঙ্ঘিত হলে তিনি তাকে "সাহিত্যের পরিমাণ লঙ্ঘন" বলে মনে করেন।[১৭] মহাভারতে ভীষ্ম চরিত্রের ক্ষেত্রে এই ত্রুটি রবীন্দ্রনাথের চোখে পড়েছে।

'সাহিত্যে চিত্রবিভাগ' প্রবন্ধে কৌরবসভায় ভীষ্মের চরিত্র সেভাবে উজ্জ্বল হয়ে উঠতে পারেনি বলে রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছেন। সাহিত্যের চরিত্র শাস্ত্রের ছকে বাঁধা অথবা কেবল নৈতিক গুণাবলির সমাহার হওয়ার চেয়ে তা "জীবনশিল্পীর স্বাক্ষরিত" হলে অর্থাৎ সাধারণ দোষেগুণে মানবিক হয়ে উঠলে বেশি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে বলে তিনি এই প্রবন্ধে মন্তব্য করেছেন। ভীষ্ম চরিত্র সম্পর্কে এখানে রবীন্দ্রনাথের মূল্যায়ন হল—

> "ও দিকে দেখো ভীষ্মকে, তাঁর গুণগানের অন্ত নেই, অথচ কৌরবসভার চিত্রশালায় তাঁর ছবির ছাপ পড়ল না। তিনি বসে আছেন একজন নিষ্কর্মা ধর্ম-উপদেশ-প্রতীক মাত্র হয়ে।"[১৮]

পাশাপাশি কর্ণ সেখানে 'ক্ষুদ্রাশয়তায় আত্মবিস্মৃত' হলেও তাঁর চরিত্র উজ্জ্বল বলে রবীন্দ্রনাথ মত প্রকাশ করেছেন।[১৯]

'পঞ্চভূত' গ্রন্থের 'মনুষ্য' প্রবন্ধে সাহিত্যে মানবচরিত্র সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে ভীষ্মের নাম উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে প্রাচীন সাহিত্যে প্রবলতার আদর ছিল। তাই তখন ভীষ্ম-দ্রোণের মতো চরিত্রের সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে কাব্য-উপন্যাসে প্রবলকে ছেড়ে সাধারণ মানুষকে চরিত্র হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে।[২০] বোঝা যায়, এখানেও রবীন্দ্রনাথ ভীষ্ম চরিত্রের মধ্যে যে প্রবলতার দিক, তাকেও সাময়িক বলতে চেয়েছেন।

মহাভারতের ভীষ্ম চরিত্র সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যগুলি পর্যালোচনা করে দেখা যায় একদিকে প্রভূত নৈতিক গুণাবলির আরোপ, আর অন্যদিকে মানুষের সাময়িক জীবনভাবনা ও সাময়িক রুচির প্রভাব সেখানে বর্তমান। নৈতিকতা এবং সাময়িকতা এই দুটি বিষয়ই প্রকৃত এবং চিরন্তন সাহিত্যের উপযোগী নয় বলে রবীন্দ্রনাথ মনে করেন।

রবীন্দ্রনাথের 'ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা' প্রবন্ধ, 'জাভা যাত্রীর পত্র'-এর সপ্তম পত্র, 'পঞ্চভূত' গ্রন্থের অন্তর্গত 'মনুষ্য' নামক রচনা ইত্যাদিতে দ্রোণাচার্য চরিত্রের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। 'ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বেদের ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও শ্রীকৃষ্ণের প্রবর্তিত মানবতাবাদের ধর্মের বিরোধই মহাভারতের মূল দ্বন্দ্ব বলে মন্তব্য করেছেন। সেখানে শ্রীকৃষ্ণের বিরোধী পক্ষে সেনাপতিদের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন ব্রাহ্মণ দ্রোণাচার্য।[২১] অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ এখানে দ্রোণাচার্যকে ব্রাহ্মণ্য-তন্ত্রের একজন অন্যতম প্রতিভূ হিসেবে দেখেছেন। 'জাভা-যাত্রীর পত্র'-এর সপ্তম পত্রে রবীন্দ্রনাথ জাভাতে প্রচলিত মহাভারতের একটি বিষয় উল্লেখ করেছেন। সেখানকার পাঠ অনুযায়ী দ্রোণাচার্য ভীমকে কৌশলে বধ করবার জন্যে একবার কোনো এক অসাধ্য কর্মে পাঠিয়েছিলেন। এটি উল্লেখ করার পর রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেন,

> "দ্রুপদ-বিদ্বেষী দ্রোণ যে পাণ্ডবদের অনুকূল ছিলেন না, তার হয়তো প্রমাণ এখানকার মহাভারতে আছে।"[২২]

শ্রীকৃষ্ণ প্রবর্তিত মানবতাবাদী ধর্মের পরিপালক ছিলেন পাণ্ডবরা। বিরুদ্ধপক্ষীয় দ্রোণাচার্য ভীমের ক্ষতিসাধন করার চেষ্টা করেছেন এরকম পাঠ রবীন্দ্রনাথের মহাভারত-ভাবনার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। 'পঞ্চভূত' গ্রন্থের 'মনুষ্য' নামক প্রবন্ধে তিনি প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে প্রবলতার আদর ছিল বলে মনে করেছেন। তাঁর ধারণা হল সেই কারণে তখনকার সাহিত্যে প্রবল তেজস্বী চরিত্রদের সৃষ্টি হয়েছিল। এখানে সেই-জাতীয় চরিত্রের উদাহরণ হিসেবে ভীষ্মের সঙ্গে দ্রোণাচার্যের নামও তিনি উল্লেখ করেছেন।[২৩] সুতরাং, রবীন্দ্রনাথের মূল্যায়নে দ্রোণাচার্যের চরিত্র হল প্রবল এবং তিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রবর্তিত মানবতাবাদী ধর্মের বিরুদ্ধে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের অন্যতম প্রধান প্রতিভূ।

'কাহিনী' কাব্যের 'গান্ধারীর আবেদন' নাট্যকাব্যে রবীন্দ্রনাথ ধৃতরাষ্ট্র চরিত্রটিকে রূপায়ণ করেছিলেন মেরুদণ্ডহীন স্নেহান্ধ পিতা হিসেবে। তাঁর 'সাহিত্যের স্বরূপ' গ্রন্থের অন্তর্গত 'সাহিত্যে চিত্রবিভাগ' নামক প্রবন্ধেও ধৃতরাষ্ট্রের উল্লেখ

লক্ষ করা যায়। কৌরবসভায় নৈতিক গুণাবলির অধিকারী ভীষ্ম কিংবা বিদুরের তুলনায় ধৃতরাষ্ট্রের চিত্রকে অনেক বেশি উজ্জ্বল বলে তিনি মনে করেছেন। তাঁর চরিত্র সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য হল—

> "অপর পক্ষে স্বয়ং ধৃতরাষ্ট্র ধর্মবুদ্ধির বেদনায় প্রতি মুহূর্তে পীড়িত অথচ স্নেহে দুর্বল হয়ে এমন অন্ধভাবে সেই বুদ্ধিকে ভাসিয়ে দিয়েছেন যে যদিচ জেনেছেন অধর্মের এই পরিণাম তাঁর স্নেহাস্পদের পক্ষে দারুণ শোচনীয়, তবু কিছুতে আপনার দোলায়িত চিত্তকে দৃঢ়ভাবে সংযত করতে পারেন নি। এই হল স্বয়ং জীবনের কল্পিত ছবি— মনুসংহিতার শ্লোকের উপরে উপদেশের দাগা বুলানো নয়। এই ধৃতরাষ্ট্র রাজ্য হারালেন, প্রাণাধিক সন্তানদের হারালেন, কিন্তু সাহিত্যের সিংহাসনে এই দিক্‌ভ্রান্ত অন্ধ তিনি চিরকালের জন্যে স্থির রইলেন।"[২৪]

অর্থাৎ এখানে রবীন্দ্রনাথ একদিকে ধর্মবুদ্ধি ও অন্যদিকে পুত্রস্নেহে ধৃতরাষ্ট্রের যে দ্বন্দ্ব, সেটির উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এই দোষে-গুণে, অন্তর্দ্বন্দ্বে, দুর্বলতায় ধৃতরাষ্ট্র চরিত্রটি অত্যন্ত উজ্জ্বল এবং সাহিত্য গুণান্বিত হয়েছে বলে তিনি মনে করেছেন। লক্ষণীয় যে তাঁর 'গান্ধারীর আবেদন' কাব্যনাট্যে মেরুদণ্ডহীন স্নেহান্ধ ধৃতরাষ্ট্রের তুলনায় ন্যায়বুদ্ধিপরায়ণ গান্ধারী ছিলেন বেশি সমুজ্জ্বল। সৃজনশীল রচনা ও মননধর্মী রচনায় রবীন্দ্রনাথের এই চরিত্রটি সম্পর্কিত ভাবনাতেও কিছু পার্থক্য লক্ষ করা যায়।

বিদুর চরিত্রটির নাম রবীন্দ্রনাথের দু-একটি প্রবন্ধে উল্লিখিত আছে। 'সাহিত্যের স্বরূপ' গ্রন্থের অন্তর্গত 'সাহিত্যে চিত্রবিভাগ' প্রবন্ধটি এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য। এখানে তিনি মন্তব্য করেছেন,

> "এ দিকে দেখো বিদুরকে, সে নিখুঁত ধার্মিক; এত নিখুঁত যে, সে কেবল কথাই কয় কিন্তু কেউ তার কথা মানতেই চায় না।"[২৫]

অর্থাৎ বিদুরকেও রবীন্দ্রনাথ নৈতিক গুণাবলি ও পাণ্ডিত্যের সমাহার বলেই মনে করেছেন। কিন্তু তাঁর মতে বিদুর আদর্শ সাহিত্যিক চরিত্র হয়ে উঠতে পারেননি।

'কাহিনী' কাব্যের 'কর্ণকুন্তীসংবাদ' নামক রচনায় রবীন্দ্রনাথ কর্ণ চরিত্রের আদর্শ ও কর্তব্যের প্রতি নিষ্ঠার দিকটিকে রূপায়িত করেছিলেন। প্রবন্ধে মহাভারতের কর্ণ সাহিত্যিক চরিত্র হিসেবে কতখানি সার্থক সে বিষয়ে আলোচনা তিনি করেছেন। 'আধুনিক সাহিত্য' গ্রন্থের 'কৃষ্ণচরিত্র', 'সাহিত্যের স্বরূপ' গ্রন্থের 'সাহিত্যে চিত্রবিভাগ' ইত্যাদি প্রবন্ধের নাম এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'কৃষ্ণচরিত্র' গ্রন্থটির সমালোচনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গক্রমে মন্তব্য করেছেন,

> "মহাভারতকার কবি যে একটি বীরসমাজ সৃষ্টি করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে একটি সুমহৎ সামঞ্জস্য আছে, কিন্তু ক্ষুদ্র সুসংগতি নাই।"[২৬]

কর্ণ চরিত্রে "ক্ষুদ্র সুসংগতি" না থাকলেও সেই "সুমহৎ সামঞ্জস্য" তিনি দেখতে পেয়েছেন— মহাভারতের কর্ণ সভাপর্বে পাণ্ডবদের প্রতি যে-সকল হীনতাচরণ করিয়াছেন আমাদের নাটক-নভেলের দীনেশ রমেশ গণেশ ধনেশ-বর্গ কখনোই তাহা করেন না, তাঁহারা সময়ে-অসময়ে স্থানে-অস্থানে অনায়াসেই আত্মবিসর্জন করিয়া থাকেন, তথাপি মহাভারতের কবি বিনা চেষ্টায় কর্ণকে যে অমরলোকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিয়েছেন এই দীনেশ রমেশ গনেশ ধনেশ -বর্গ সমালোচকপ্রদত্ত সমস্ত ফার্স্টক্লাস-টিকিট এবং নৈতিক পাথেয় লইয়াও তাহার নিম্নতম সোপান পর্যন্ত পৌঁছিতে পারেন কি না সন্দেহ।[২৭] রবীন্দ্রনাথ বলতে চেয়েছেন যে কর্ণ শুধুমাত্র দানবীর এবং যুদ্ধবিশারদ ছিলেন না। তাঁর চরিত্রে বিভিন্ন হীন আচরণও ছিল। তাই শুধুমাত্র ভালো অথবা মন্দ চরিত্র হওয়ার পরিবর্তে তিনি অনেক বেশি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছেন। 'সাহিত্যে চিত্রবিভাগ' প্রবন্ধেও রবীন্দ্রনাথ অনুরূপ মন্তব্য প্রকাশ করেছেন—

> "ও দিকে দেখো কর্ণকে, বীরের মতন উদার, অথচ অতিসাধারণ মানুষের মতন বার বার ক্ষুদ্রাশয়তায় আত্মবিস্মৃত।"[২৮]

আদর্শ সাহিত্যিক চরিত্র যেমন বিভিন্ন সদ্‌গুণের সমাহার নন, তেমনি সম্পূর্ণ ভালো অথবা সম্পূর্ণ মন্দ একটি ভাব নিয়েও আদর্শ চরিত্র গড়ে ওঠে না। এই জন্য মহাভারতের কবি কর্ণ চরিত্রটিকে মহত্ত্বে ও ক্ষুদ্রতায় মিলিয়ে "অমরলোকে প্রতিষ্ঠিত" করেছেন বলে রবীন্দ্রনাথ মনে করেছেন। সেই সঙ্গে আধুনিক উপন্যাস-সাহিত্যের প্রভূত সদ্‌গুণের অধিকারী

পুরুষ চরিত্রদের সঙ্গে মহাভারতের একইসঙ্গে দানবীর এবং ক্রূরকর্মা কর্ণের পার্থক্যের জায়গাটিও তিনি নির্দেশ করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ছন্দ' গ্রন্থে গদ্যছন্দ সম্পর্কে আলোচনার তৃতীয় পর্যায়ে 'পুনশ্চ' কাব্যের গদ্যরীতি সম্পর্কে বলতে গিয়ে প্রসঙ্গক্রমে মহাভারতের যুধিষ্ঠির ও কর্ণ চরিত্রের তুলনা করেছেন। যেমন—

> "...কর্ণের চারিত্রশক্তি যুধিষ্ঠিরের চেয়ে অনেক বড়ো। অথচ একরকম শিশুমতি আছে যারা ধর্মরাজের কাহিনী শুনে অশ্রুবিগলিত হয়।"[২৯]

সুতরাং, যুধিষ্ঠির চরিত্র সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের খুব বেশি উচ্চ ধারণা ছিল না এ-কথা এই মন্তব্য থেকে নিঃসন্দেহে বলা যায়। পরবর্তী সময়ে বুদ্ধদেব বসুর 'মহাভারতের কথা', ধীরেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের 'নায়ক যুধিষ্ঠির' ইত্যাদি গ্রন্থে মহাভারতের যুধিষ্ঠির চরিত্রটিকে যেভাবে দোষে-গুণে, দৃঢ়তা ও দুর্বলতায় ব্যাখ্যা করা হয়েছে, তার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ধারণার পার্থক্য আমরা লক্ষ করতে পারি।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণচরিত্র' গ্রন্থের সমালোচনা করতে গিয়ে মহাভারতের কৃষ্ণ চরিত্রটি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বেশ কিছু মন্তব্য করেছেন। এছাড়া তাঁর 'ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা' নামক প্রবন্ধ, 'জাভা-যাত্রীর পত্র'-এর সপ্তম পত্র ইত্যাদিতে কৃষ্ণ সম্পর্কে আলোচনা লক্ষ করা যায়। 'আধুনিক সাহিত্য' গ্রন্থের অন্তর্গত 'কৃষ্ণচরিত্র' শীর্ষক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ মহাভারতের কৃষ্ণ সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছেন—

> "...বঙ্কিম দেবতা-কৃষ্ণকে নহে, মানুষ-কৃষ্ণকেই মহাভারত হইতে আবিষ্কার করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। কিন্তু যে মানুষকে বঙ্কিম খুঁজিতেছিলেন, তাহার কোথাও কোনো অসম্পূর্ণতা নাই, তাহার সমস্ত চিত্তবৃত্তি সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপ্রাপ্ত। অর্থাৎ সে একটি মূর্তিমান থিওরি। কিন্তু সম্ভবত মহাভারতকারের কৃষ্ণ দেবতা নহেন, অনুশীলনপ্রাপ্ত চিত্তবৃত্তি নহেন, তিনি কৃষ্ণ।"[৩০]

রবীন্দ্রনাথ আরো বলেন,

> "মহাভারতকার এমন একটি মানুষের সৃষ্টি করেন নাই যিনি মনুষ্য-আকার-ধারী তত্ত্বকথা বা নীতিসূত্র মাত্র।"[৩১]

তিনি মনে করেছেন একজন বিখ্যাত ব্যক্তি সম্পর্কে যেমন ভালো-মন্দ নানা-রকম জনশ্রুতি প্রচলিত থাকে, তেমনি কৃষ্ণ সম্পর্কেও প্রচলিত ছিল। যেহেতু কোনো ব্যক্তি অবিমিশ্র ভালো কিংবা মন্দ হতে পারে না, তাই এই উভয় চিত্রকেই তিনি আংশিক সত্য বলে মনে করেছেন।[৩২] বাস্তব মানুষ এবং সাহিত্যের চরিত্র হুবহু এক রকম হতে পারে না। বাস্তব কৃষ্ণের অনেক গ্রহণ-বর্জন এবং মহাভারতকারের কল্পনার সংযোগে মহাভারতের কৃষ্ণ চরিত্রটি গড়ে উঠেছে বলে তিনি মন্তব্য করেছেন। তাঁর মতে, মহাভারতের কৃষ্ণ বাস্তব কৃষ্ণের চেয়ে বেশি সত্য—

> "...কবি বাস্তবিক-কৃষ্ণ অপেক্ষা তাঁহার কৃষ্ণকে অধিকতর সত্য করিয়া তুলিয়াছেন।"[৩৩]

রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে তাঁর 'তথ্য ও সত্য' প্রবন্ধে বলেছিলেন,

> "যেহেতু সাহিত্য ও ললিতকলার প্রধান কাজই হচ্ছে প্রকাশ, এইজন্যে তথ্যের পাত্রকে আশ্রয় করে আমাদের মনকে সত্যের স্বাদ দেওয়াই তার প্রধান কাজ।"[৩৪]

এখানে বাস্তব কৃষ্ণের চরিত্র হল তথ্য। সেই তথ্য অবলম্বনে সৃষ্ট হয়েছে মহাভারতের কৃষ্ণ চরিত্রটি, যা রবীন্দ্রনাথের মতে বাস্তবের চেয়ে বেশি সত্য। সেখান থেকে ঐতিহাসিক কৃষ্ণ সম্পর্কে প্রকৃত ধারণা খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়।

'ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ শ্রীকৃষ্ণকে বেদনির্ভর ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের বিরুদ্ধে উত্থিত ভক্তির ধর্মের প্রাণপুরুষ বলে মনে করেছেন। বৈদিক ধর্মের অনুসারী জরাসন্ধ নরবলির আয়োজন করলে কৃষ্ণ যে তাঁকে কৌশলে হত্যা করিয়ে তা নিবারণ করেন, রবীন্দ্রনাথ সেই বিষয়টির প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। আবার যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে কৃষ্ণকে অর্ঘ্য দান করা হলে জরাসন্ধের অনুগামী শিশুপাল তাঁকে অপমান করেন। তিনি সেখানে কৃষ্ণবিরোধী শক্তির মুখপাত্র বলে রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছেন। যুধিষ্ঠিরের এই যজ্ঞে শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণের পাদপ্রক্ষালনের কাজ করেছেন এমন বর্ণনাকে রবীন্দ্রনাথ 'অত্যুক্তির প্রয়াস' বলে মনে করেছেন। তাঁর মতে, এখানে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় বিরোধের ইতিহাস দেখা যায়। আর কৃষ্ণ এখানে বেদনির্ভর ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের বিপক্ষে ভক্তির ধর্মের প্রচারক।[৩৫] 'জাভা-যাত্রীর পত্র'- এর সপ্তম পত্রেও রবীন্দ্রনাথ অনুরূপ মতামত প্রকাশ করেছেন।[৩৬]

মহাভারতের কৃষ্ণ চরিত্রটি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যগুলি পর্যালোচনা করে বলা যায়, তিনি কৃষ্ণকে দেবতা অথবা সমস্ত নৈতিক গুণাবলির প্রতিমূর্তি বলে মনে করেননি। আদর্শ সাহিত্যিক চরিত্র হিসেবে মহাভারতের কৃষ্ণ তাঁর দৃষ্টিতে ধরা পড়েছেন।

মহাভারতের দ্রৌপদী চরিত্র সম্পর্কেও রবীন্দ্রনাথের কিছু কিছু মন্তব্য বিভিন্ন জায়গায় লক্ষ করা যায়। 'কৃষ্ণচরিত্র', 'ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা' ইত্যাদি প্রবন্ধ; 'জাভা-যাত্রীর পত্র' গ্রন্থ ইত্যাদির কথা এ-প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে। 'কৃষ্ণচরিত্র' প্রবন্ধে দ্রৌপদীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ আধুনিক উপন্যাস-সাহিত্যের নায়িকাদের তুলনা করে মন্তব্য করেছেন—

> খুব সম্ভব আধুনিক খ্যাত অখ্যাত অনেক 'আর্য' বাঙালি লেখকই সরলা বিমলা দামিনী যামিনী -নামধেয়া এমন-সকল সত্যি চরিত্রের সৃষ্টি করিতে পারেন যাঁহারা আদ্যোপান্তসুসংগত অপূর্ব নৈতিক গুণে দ্রৌপদীকে পদে পদে পরাভূত করিতে পারেন, কিন্তু তথাপি মহাভারতের দ্রৌপদী তাঁহার সমস্ত অপূর্ণতা অসংকোচে বক্ষে বহন করিয়া এই-সমস্ত নব্য-বল্মীক-রচিত ক্ষুদ্র নীতিস্তূপগুলির বহু ঊর্ধ্বে উদার আদিম অপর্যাপ্ত প্রবল মাহাত্ম্যে নিত্যকাল বিরাজ করিতে থাকিবেন।[৩৭]

সুসংগতি, বাস্তবনিষ্ঠা, নৈতিক গুণ ইত্যাদির অভাব সত্ত্বেও মহাভারতকারের কল্পনায় "সুমহৎ সামঞ্জস্য" থাকার কারণেই দ্রৌপদী চরিত্রটি অমর হতে পেরেছে বলে তাঁর ধারণা। আধুনিক সাহিত্যের নায়িকাদের সঙ্গে মহাভারতের নায়িকা দ্রৌপদীর পার্থক্যের দিকটিও রবীন্দ্রনাথ নির্দেশ করেছেন।

'ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা' প্রবন্ধে দ্রৌপদী সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের অন্যরকম ভাবনার পরিচয় পাওয়া যায়। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকে তিনি বেদের ধর্ম ও কৃষ্ণের ধর্মের দ্বন্দ্ব বলে মনে করেছেন। তাঁর ভাবনা অনুযায়ী দ্রৌপদী বা কৃষ্ণা হলেন কৃষ্ণ-প্রবর্তিত তত্ত্ব বা জ্ঞান। 'জাভা-যাত্রীর পত্রে' তিনি বিষয়টিকে আরো স্পষ্টতর করে প্রকাশ করেছেন—

> "মহাভারতেরও অর্থ পাওয়া যায়, লক্ষ্যবেধের মধ্যে। এই শূন্যস্থিত লক্ষ্যবেধের মধ্যে এমন একটি সাধনার সংকেত আছে যে, একাগ্রসাধনার দ্বারা কৃষ্ণাকে পাওয়া যায়; আর এই যজ্ঞসম্ভবা কৃষ্ণা এমন একটি তত্ত্ব যাকে নিয়ে একদিন ভারতবর্ষে ভীষণ দ্বন্দ্ব বেধে গিয়েছিল। একে একদল স্বীকার করেছিল, একদল স্বীকার করে নি। কৃষ্ণকে পঞ্চ পাণ্ডব গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু কৌরবেরা তাঁকে অপমান করতে ত্রুটি করেন নি।"[৩৮]

রবীন্দ্রনাথ এখানে দ্রৌপদীকে মহাভারতের প্রধান নারী চরিত্র হিসেবে মনে করা ছাড়াও একটি বিশেষ সত্যকে তাঁর চরিত্রের মধ্যে দেখতে পেয়েছেন। যাগযজ্ঞ, পশুবলি, নরবলি, শিশুবলি ইত্যাদির উপরে ভিত্তি করে গড়ে ওঠা বৈদিক ধর্মের বিরুদ্ধে কৃষ্ণ যে মানবতাবাদী তত্ত্ব বা ধর্মমতের কথা বলেছেন, দ্রৌপদীর মধ্যে তা প্রতীকায়িত হয়েছে বলে তিনি মন্তব্য করেছেন। বনপর্বে ব্রাহ্মণ ঋষিদের বনে কৃষ্ণার অক্ষয় অন্নপাত্র থেকে অন্নদানের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ কৃষ্ণ প্রবর্তিত সেই তত্ত্বের প্রচারের ইঙ্গিতও দিয়েছেন।[৩৯]

সুতরাং, দ্রৌপদী চরিত্রটিকে রবীন্দ্রনাথ দুদিক থেকে পর্যবেক্ষণ করেছেন বলা যায়। একদিকে তাঁর কাছে দ্রৌপদী সমস্ত অসংগতি সত্ত্বেও একাধিক কবির হস্তক্ষেপের ফলে বিভিন্ন আপাত সংগতিহীন পরস্পরবিরোধী বিষয় যেমন মহাভারতে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে, তেমনই বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যেও এই অসংগতি, পরস্পরবিরোধিতা ইত্যাদি লক্ষ করা যায়।

মহাভারতের চরিত্রাবলি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মনোভাব বিষয়ক আলোচনা থেকে বলা যায় যে, চরিত্রগুলিকে তিনি সাহিত্যিক চরিত্র হিসেবেই দেখতে চেয়েছেন। সাহিত্য বিচারের মাপকাঠিতেই সেই সমস্ত চরিত্রের সার্থকতা অথবা ব্যর্থতা তিনি নির্ধারণ করার চেষ্টা করেছেন। মহাভারতে কোনো কোনো ক্ষেত্রে একই চরিত্রের মধ্যে বিভিন্ন বিপরীতধর্মী আচরণ যেখানে দেখা যায়, সেখানে সুসংগতির অভাব রবীন্দ্রনাথের চোখে সেভাবে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়নি। বরং নিছক ভালো অথবা নিছক খারাপ চরিত্র হবার পরিবর্তে ভালো ও মন্দের সংযোগে নির্মিত এই চরিত্রগুলিতে একটি 'সুমহৎ সামঞ্জস্য' তিনি দেখতে পেয়েছেন। শ্রীদেবীপদ ভট্টাচার্য তাঁর 'মহাভারত-প্রসঙ্গ ও রবীন্দ্রনাথ' নামক প্রবন্ধে মহাভারতের চরিত্র সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের এই মনোভাবের ইতিবাচক সমালোচনা করেছেন। মহাভারতের কর্ণ ও দ্রৌপদী চরিত্রে রবীন্দ্রনাথ "আদিম বলিষ্ঠতা" দেখতে পেয়েছেন বলে তিনি উল্লেখ করেন।[৪১] আধুনিক গল্প-উপন্যাসের চরিত্রের সঙ্গে মহাভারতের চরিত্রগুলির পার্থক্যের বিষয়টিও রবীন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন। মহাভারত অবলম্বনে রচিত

কবিতা, নাট্যকাব্য, কাব্যনাট্য, নৃত্যনাট্য ইত্যাদিতে বিভিন্ন চরিত্রগুলিকে নতুনভাবে রূপায়িত করলেও প্রবন্ধের ক্ষেত্রে সেগুলিকে যথাযথ রেখে আলোচনা করেছেন। মহাভারতকারের সৃষ্ট চরিত্রগুলির সমালোচনাই তিনি করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের মহাভারত-চিন্তনের প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে মহাভারতের বিভিন্ন অসংগতি সম্পর্কে তাঁর মন্তব্যগুলি বিশেষভাবে আমাদের নজরে আসে। মহাভারতকে তিনি সংকলিত গ্রন্থ বলে মনে করেন। বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে ভারতবর্ষের জাতি-বৈচিত্র্যের ঐক্য নষ্ট হয়ে গিয়েছিল বলে রবীন্দ্রনাথ মত প্রকাশ করেছেন।[৪২] তখনই প্রাচীন আর্য-সমাজের বিভিন্ন বিক্ষিপ্ত কাহিনি ও জীবনদর্শনের সারবস্তু-সমূহকে সংকলন করা হয়— আসল কথা, যে জাতি বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল কোনো একটি দৃঢ়নিশ্চল কেন্দ্রকে স্বীকার না করিলে তাহার পরিধি নির্ণয় কঠিন হয়। তাহার পরে আর্যসমাজে যত কিছু জনশ্রুতি খণ্ড খণ্ড আকারে চারি দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল তাহাদিগকেও একত্র করিয়া মহাভারত নামে সংকলিত করা হইল।[৪৩]

কোনো একটি কাহিনির মধ্যে বিভিন্ন বিরুদ্ধ বিষয়কে সংকলিত করা হলে সেখানে সংগতি রক্ষা করা সহজসাধ্য নয়। মহাভারতের মধ্যেও তাই বিভিন্ন অসংগতি, পরস্পরবিরোধিতা ইত্যাদি থাকা স্বাভাবিক। সেগুলি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মনোভাব কেমন ছিল তা নিয়ে এখন আমরা আলোচনা করব।

মহাভারতে মূল-কাহিনি, অসংখ্য উপকাহিনি ইত্যাদির সঙ্গে বিভিন্ন তত্ত্ব-দর্শন এবং উপদেশাবলি বর্ণিত হয়েছে। কাহিনির গতিকে থামিয়ে দিয়ে সুদীর্ঘ উপদেশবাক্য মহাভারতের বহু জায়গায় লক্ষ করা যায়। উদাহরণ হিসেবে আমরা ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি কণিকের মন্ত্রণা, বিদুর-নীতি, নারদের উপদেশ ইত্যাদি জায়গাগুলির কথা বলতে পারি। 'সাহিত্যের স্বরূপ' গ্রন্থের অন্তর্গত 'সাহিত্যের মাত্রা' নামক প্রবন্ধে মহাভারতের এই দিকটির প্রতি তিনি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।[৪৪] রবীন্দ্রনাথের পরিভাষায় এটি হল 'সাহিত্যের আদর্শ অনুসারে নিঃসন্দেহেই অপরাধ'। মহাভারতের বিভিন্ন অসংগতির মধ্যে শরশয্যাশায়ী ভীষ্মের নীতিকথা এবং কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পূর্বে কৃষ্ণের গীতা কথনের দৃষ্টান্ত তিনি উল্লেখ করেছেন। ভীষ্মের নীতিকথার মধ্যে ছিল "সাময়িক প্রয়োজনের প্রাবল্য"।[৪৫] আর "ভগবদ্গীতা আজও পুরাতন হয় নি, হয়তো কোনোকালেই পুরাতন হবে না। কিন্তু কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকে থমকিয়ে রেখে সমস্ত গীতাকে আবৃত্তি করা সাহিত্যের আদর্শ অনুসারে নিঃসন্দেহেই অপরাধ। শ্রীকৃষ্ণের চরিত্রকে গীতার ভাবের দ্বারা ভাবিত করার সাহিত্যিক প্রণালী আছে, কিন্তু সৎ কথার প্রলোভনে তার ব্যতিক্রম হয়েছে বললে গীতাকে খর্ব করা হয় না।"[৪৬] সুতরাং, মহাভারত সংকলনের বিষয়টির প্রতি রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধাবোধ থাকলেও সাহিত্যিক বিচারের সময়ে তিনি নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গিই অবলম্বন করেছেন। ভীষ্মের নীতিকথা, কৃষ্ণের গীতা ইত্যাদি জায়গাগুলিকে সাহিত্যিক দিক থেকে তিনি অসংগতি বলেই মনে করেছেন।

মহাভারতের বিভিন্ন চরিত্র সম্পর্কে অসংগতির যে অভিযোগ সমালোচকেরা তুলে থাকেন, সে-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের মতামত আমরা আগেই আলোচনা করেছি। মহাভারতকারের নির্মিত একই চরিত্রে বিভিন্ন পরস্পরবিরোধী আচরণ এই অভিযোগের কারণ। রবীন্দ্রনাথ এখানে চরিত্র নির্মাণে মহাভারতকারের 'ক্ষুদ্র সুসংগতি'-র অভাবের তুলনায় 'সুমহৎ সামঞ্জস্যে'র দিকটির প্রতি বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। অতএব সাহিত্যিক বিচারের ক্ষেত্রে মহাভারতে সংকলিত বিভিন্ন নীতিকথাগত এবং চরিত্রগত অসংগতিগুলিকে তিনি দু'রকমভাবে দেখেছেন। নীতিকথা সংযুক্তির বিষয়টিকে 'অপরাধ' বললেও একই চরিত্রের পরস্পরবিরোধী আচরণের বিষয়টিতে তিনি সামঞ্জস্যের অভাব আছে বলে মনে করেননি।

মহাভারতের প্রক্ষিপ্ত একটি বহু-চর্চিত এবং বহু-বিতর্কিত বিষয়। এ-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের মনোভাব কেমন ছিল তা নিয়ে এখন আমরা আলোচনা করব। 'আধুনিক সাহিত্য' গ্রন্থের অন্তর্গত 'কৃষ্ণচরিত্র' প্রবন্ধে তিনি বলেছেন,

> "মহাভারতের আদিকবির মূল রচনাটি উদ্ধার করা হইলে মানবজাতির একটি পরমতম লাভ হইবে।"[৪৭]

অর্থাৎ মহাভারতে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কবির রচনার যে অনুপ্রবেশ ঘটেছে, তাতে আদি কাব্যটির মান অবনমিত হয়েছে বলে তিনি মনে করেন। 'সাহিত্যের মাত্রা' প্রবন্ধে তিনি বলেছেন,

> "মহাভারতে নানা কালে নানা লোকের হাত পড়েছে সন্দেহ নেই। সাহিত্যের দিক থেকে তার উপরে অবান্তর আঘাতের অন্ত ছিল না, অসাধারণ মজবুত গড়ন বলেই টিকে আছে।"[৪৮]

রবীন্দ্রনাথের মতে মহাভারতের এই সমস্ত প্রক্ষিপ্তের বিষয়ে করণীয় কী, সে-সম্পর্কে অনুধাবন করা যেতে পারে। বঙ্কিমচন্দ্র প্রক্ষিপ্ত বর্জনের মাধ্যমে মহাভারতের আদি রূপটি কেমন ছিল, তা নির্ণয় করার চেষ্টা করেছিলেন। আধুনিক গবেষকদের অনেকের মধ্যেও এই প্রবণতা লক্ষ করা যায়। কিন্তু তাঁদের মধ্যে মত-পার্থক্য অত্যন্ত বেশি হওয়ায় নির্দিষ্ট কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব হয়নি। 'কৃষ্ণচরিত্র' গ্রন্থটির সমালোচনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের অনুসন্ধানের পদ্ধতির সমালোচনা করেছেন। তাঁর মতে বঙ্কিমচন্দ্র "নিজের আদর্শ অনুসারে" এই কাজে অগ্রসর হয়েছেন।[৪৯] অর্থাৎ, নিজস্ব মতামতকে প্রতিষ্ঠা দেবার জন্য কোনো সংগত যুক্তি ছাড়াই স্বমতের বিরোধী অংশগুলিকে প্রক্ষিপ্ত বলে বর্জনের বিষয়টিকে তিনি গ্রহণ করতে চাননি। রবীন্দ্রনাথ এ-বিষয়ে পক্ষপাতশূন্য মনোভাব রক্ষা করার বিষয়ে সচেতন থাকার কথা বলতে চেয়েছেন। মহাভারতের আদিরূপ নির্ণয়ের প্রচেষ্টাকে তিনি কার্যকরী মনে করলেও তাঁর মতে তা সহজসাধ্য নয়। এক্ষেত্রে প্রকৃত পদ্ধতি কীরকম হবে সে বিষয়ে তিনি মন্তব্য করেননি। সমস্ত প্রক্ষিপ্ত বাদ দিয়ে মহাভারতের মূলরূপ কোনো সময়ে আবিষ্কৃত হওয়া সম্ভব কিনা সে বিষয়েও তিনি কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেননি। বিষয়টিকে রবীন্দ্রনাথ একটি তথ্য এবং যুক্তিনিষ্ঠ গবেষণাক্ষেত্রের অন্তর্গত বলে মনে করেছেন। তাঁর মতে, বঙ্কিমচন্দ্রের অন্বেষণ যথেষ্ট তথ্যনিষ্ঠ ছিল না।[৫০]

সুতরাং, মহাভারতের প্রক্ষিপ্ত সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত যুক্তিনির্ভর এবং বৈজ্ঞানিক বলা যায়। বেশিরভাগ গবেষক এবং সমালোচক নিজস্ব মতের প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে একটি নির্দিষ্ট পক্ষ অবলম্বন করলেও রবীন্দ্রনাথ বিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিষয়টিকে দেখতে চেয়েছেন। নির্দিষ্ট কোনো গবেষণা-পদ্ধতির কথা এবং গবেষণার সফলতা সম্পর্কে তিনি অনুমাননির্ভর কোনো মন্তব্য করেননি।

মহাভারতের সাহিত্যমূল্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মতামতের পর্যালোচনায় কতকগুলি দিক আমাদের নজরে আসে। মহাভারতকে তিনি যে একটি মহাকাব্য হিসেবে দেখতে চেয়েছেন, তা তাঁর বিভিন্ন মন্তব্য থেকে আমরা বুঝতে পারি। বিভিন্ন জায়গায় মহাভারত সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে পরোক্ষভাবে মহাকাব্যের লক্ষণগুলির সাপেক্ষে তিনি এর বিচার করেছেন। মহাভারতের অনেক চরিত্র সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ যে উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন এ-কথা বলা যায়। আবার বিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিভিন্ন চরিত্রের সমালোচনাও তিনি করেছেন। মহাভারতের বিভিন্ন অসংগতিগুলিকে তিনি নিরপেক্ষভাবে সাহিত্য-বিচারের পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করেছেন। মহাভারতের প্রক্ষিপ্ত সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মতামত নির্দিষ্ট কোনো পক্ষ অবলম্বন করেনি। বরং তিনি যুক্তিবাদী ও নিরপেক্ষ গবেষণার কথা এ-প্রসঙ্গে বলেছেন। ভবতোষ দত্তের মতে, রবীন্দ্রনাথ মহাভারতকে সাহিত্য হিসেবেই দেখতেন। তিনি তাঁর আলোচনায় আরো মনে করেছেন যে রবীন্দ্রনাথ মহাভারতের 'poetic character' একান্তভাবে প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃত সাহিত্যের অনুসারী বলে ধারণা পোষণ করতেন।[৫১]

রবীন্দ্রনাথ মহাভারতকে যে সাহিত্য হিসেবে যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতেন, এই আলোচনা থেকে আমাদের কাছে তা সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়। মহাভারতকে অবলম্বন করে তাঁর নির্দিষ্ট কোনো তন্নিষ্ঠ রচনা না থাকলেও বিভিন্ন জায়গায় সাহিত্য হিসেবে এর মূল্যায়ন তিনি করেছেন। মন্তব্যগুলি বিভিন্ন রচনার মধ্যে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকলেও তার মধ্যে সামঞ্জস্যের কোনো অভাব নেই, যা তাঁর আলোচনার পরিমিতিবোধ ও গভীর বিশ্লেষণী ক্ষমতার পরিচয় দেয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে মহাভারতের একজন প্রকৃত সমালোচক ছিলেন, আমাদের এই আলোচনার মাধ্যমে সেটি প্রমাণিত হয়।

তথ্যসূত্র :

১. ভট্টাচার্য, শ্রীদেবীপদ, 'মহাভারত-প্রসঙ্গ ও রবীন্দ্রনাথ', সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, পত্রিকাধ্যক্ষ শ্রীপুলিনবিহারী সেন, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ২৪১। ১ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা ৬, বর্ষ ৬৬, রবীন্দ্র সংখ্যা, পৃ. ২৫৫ (অতঃপর 'মহাভারত-প্রসঙ্গ ও রবীন্দ্রনাথ', শ্রীদেবীপদ ভট্টাচার্য)
২. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'কৃষ্ণচরিত্র', 'আধুনিক সাহিত্য', বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ৬ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু

রোড কলকাতা ১৭, পুনর্মুদ্রণ, মাঘ ১৪২৬, পৃ. ৭৯ (অতঃপর 'কৃষ্ণচরিত্র', 'আধুনিক সাহিত্য')
৩. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'রামায়ণ', 'প্রাচীন সাহিত্য', বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ৬ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা ১৭, পুনর্মুদ্রণ শ্রাবণ ১৪২২, পৃ. ৬ (অতঃপর 'রামায়ণ', 'প্রাচীন সাহিত্য')
৪. ঐ, পৃ. ৬
৫. ঐ, পৃ. ৫
৬. ঐ, পৃ. ৬
৭. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'চিঠিপত্র', বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ৬ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা ১৭, পরিবর্তিত সংস্করণ, নবম খণ্ড, পুনর্মুদ্রণ আষাঢ় ১৪২৪, পৃ. ২১১
৮. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা', 'প্রাচীন সাহিত্য', বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ৬ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা ১৭, পুনর্মুদ্রণ শ্রাবণ ১৪২২, পৃষ্ঠা— ১৮ (অতঃপর 'কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা', 'প্রাচীন সাহিত্য')
৯. 'রামায়ণ', 'প্রাচীন সাহিত্য', পৃ. ১১
১০. 'Rabindranath Tagore on the Ramayana & the Mahabharata', Bhabatosh Datta, The Asiatic Society, 1 Park Street, Kolkata, Reprinted in February 2016, Page. 29
১১. Ibid, Page. 23
১২. 'সাহিত্যের মাত্রা', 'সাহিত্যের স্বরূপ', বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ৬ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা ১৭, পুনর্মুদ্রণ ১৪১৪, পৃ. ১৪ (অতঃপর 'সাহিত্যের মাত্রা')
১৩. বসু, বুদ্ধদেব, 'মহাভারতের কথা', আনন্দ পাবলিশার্স, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন কলকাতা ৭০০০০৯, প্রথম সিগনেট সংস্করণ ডিসেম্বর ২০১৮, পৃ. ৭
১৪. চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, 'কৃষ্ণচরিত্র', 'বঙ্কিম রচনাবলী' সাহিত্য সংসদ, কলকাতা ৯, দ্বিতীয় খণ্ড, ঊনবিংশতি মুদ্রণ, শ্রাবণ ১৪২৫, পৃ. ৮২৭
১৫. 'সাহিত্যের মাত্রা', পৃ. ১৪
১৬. ঐ, পৃ. ১৪
১৭. ঐ, পৃ. ১৫
১৮. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'সাহিত্যে চিত্রবিভাগ', 'সাহিত্যের স্বরূপ', বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ৬ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা ১৭, পুনর্মুদ্রণ ১৪১৪, পৃ. ৫৩
১৯. ঐ, পৃ. ৫৩
২০. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'মনুষ্য', 'পঞ্চভূত', বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ৬ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা ১৭, পুনর্মুদ্রণ ফাল্গুন ১৪২৭, পৃ. ৭১ (অতঃপর 'মনুষ্য')
২১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা', 'রবীন্দ্র রচনাবলী', গ্রন্থনবিভাগ, ৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর দেন, কলিকাতা, অষ্টাদশ খণ্ড, পুনর্মুদ্রণ জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৩, পৃ. ৪৩০ (অতঃপর 'ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা')
২২. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'জাভা-যাত্রীর পত্র', বিশ্বভারতী, ৬ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলিকাতা, পুনর্মুদ্রণ ফাল্গুন ১৩৯২, পৃ. ৩৫ (অতঃপর 'জাভা-যাত্রীর পত্র')
২৩. 'মনুষ্য', পৃ. ৭১
২৪. 'সাহিত্যে চিত্রবিভাগ', পৃ. ৫৩
২৫. ঐ, পৃ. ৫৩
২৬. 'কৃষ্ণচরিত্র', 'আধুনিক সাহিত্য', পৃ. ৮৪
২৭. ঐ, পৃ. ৮৪

২৮. 'সাহিত্যে চিত্রবিভাগ', পৃ. ৫৩
২৯. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'ছন্দ', বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ৬ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা ১৭, পুনর্মুদ্রণ মাঘ ১৪২৭, পৃ. ২০৫
৩০. 'কৃষ্ণচরিত্র', 'আধুনিক সাহিত্য', পৃ. ৮৩
৩১. ঐ, পৃ. ৮৩
৩২. ঐ, পৃ. ৭৪
৩৩. ঐ, পৃ. ৮১
৩৪. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'তথ্য ও সত্য', 'সাহিত্যের পথে', বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্ট্রীট, কলিকাতা, নূতন সংস্করণ, চৈত্র ১৩৬৫, পৃ. ৫৩
৩৫. 'ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা', পৃ. ৪৩০
৩৬. 'জাভা-যাত্রীর পত্র', পৃ. ৩৩
৩৭. 'কৃষ্ণচরিত্র', 'আধুনিক সাহিত্য', পৃ. ৮৪
৩৮. 'জাভা-যাত্রীর পত্র', পৃ. ৩৩
৩৯. ঐ, পৃ. ৩৪
৪০. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'ছন্দ', বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ৬ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা ১৭, পুনর্মুদ্রণ মাঘ ১৪২৭, পৃ. ২০৫
৪১. 'মহাভারত-প্রসঙ্গ ও রবীন্দ্রনাথ', শ্রীদেবীপদ ভট্টাচার্য, পৃ. ২৬৪
৪২. 'ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা', পৃ. ৪৩৮
৪৩. ঐ, পৃ. ৪৪০
৪৪. 'সাহিত্যের মাত্রা', পৃ. ১৪
৪৫. ঐ, পৃ. ১৫
৪৬. ঐ, পৃ. ১৫
৪৭. 'কৃষ্ণচরিত্র', 'আধুনিক সাহিত্য', পৃ. ৮২
৪৮. 'সাহিত্যের মাত্রা', পৃ. ১৪
৪৯. 'কৃষ্ণচরিত্র', 'আধুনিক সাহিত্য', পৃ. ৮২
৫০. ঐ, পৃ. ৭৪
৫১. 'Rabindranath Tagore on the Ramayana & the Mahabharata', Bhabatosh Datta, The Asiatic Society, 1 Park Street, Kolkata, Reprinted in February 2016, Page no. 31